

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-৫: খাদ্য নিরাপত্তা

প্রশ্ন ▶ ১ বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র আয়তনের দেশ কিন্তু জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। এই বিরাট জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দেশটির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যোৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি ও পরিউন্নয়নে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনে ভর্তুক প্রদান, কৃষি ঝণ সহজলভ্যকরণ, কৃষিতে বায়োটেকনোলজির ব্যবহার, কাবিখা, ভিজিএফসহ নানাবিধি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সময় সময় খাদ্য আমদানিরও ব্যবস্থা করছে।

জ. বো., দি. বো., সি. বো., ঘ. বো. ১৮। প্রশ্ন নং ১।
ক. ডেজাল খাদ্য কী?

খ. ডেজাল খাদ্য কীভাবে খাদ্য নিরাপত্তাকে বিস্তৃত করে? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যে বিষয়গুলোর কথা বলা হয়েছে তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি পদক্ষেপসমূহের সাথে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা থাকা জরুরি কি না ব্যাখ্যা করো।

খাদ্য নিরাপত্তা এমন একটি বিষয়, যা সরকারের একার পক্ষে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। কারণ, শুধু আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ দ্বারা খাদ্যে ডেজাল রোধ করা যায় না। বরং এক্ষেত্রে সবাইকে সচেতন ও সতর্ক হতে হবে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাও খাদ্য নিরাপদকরণে ভূমিকা পালন করে আসছে। আবার, উন্নয়নের অঙ্গীদার হিসেবে এনজিওর ভূমিকাও এ দেশে ব্যাপক। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এসব সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমাদের দেশে কেউ কেউ খাদ্যে জনে ডেজাল মেশায় আবার কেউ কেউ না জনে মেশায়। অর্থাৎ খাদ্যে ডেজালের কুফল তথা খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত পদ্ধতির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ। তাই বেসরকারি সংস্থাগুলো এক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরি করতে পারে। আবার ডেজাল বিরোধী আন্দোলনে জনগণকে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি সরকার আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে পারে। তাছাড়া পচনশীল দ্রব্য সংরক্ষণে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবস্থা করতে পারে।

সর্বোপরি সচেতনতা, সাবধানতা, ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের সততার কোনো বিকল্প নেই। তাই প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া দেশের স্বার্থে খাদ্যে ডেজাল আর ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ বিষয়ে নিয়মিত সচেতনতা আর তথ্যভিত্তিক প্রচারণা চালাতে পারে। তাই, উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি পদক্ষেপের সাথে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকাও অভ্যন্তর জরুরি।

প্রশ্ন ▶ ২ ‘A’ দেশের জনগণ অতি দরিদ্র। খাদ্যসামগ্রীও প্রয়োজনের তুলনায় ব্যতী। ‘A’ দেশে প্রতি বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রচুর ফসল হানি হয়। কিছু জনগণ অতি মুনাফালোভী হওয়ায় ফলমূল, শাকসবজি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে। ফলে ডেজাল খাদ্য খেয়ে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে দেশের সচেতন জনগণ, মিডিয়া এবং এনজিওসমূহ নিরাপদ খাদ্যের পক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠে এবং সরকারও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

জ. বো., কু. বো., চ. বো., ঘ. বো. ১৮। প্রশ্ন নং ২।

ক. নিরাপদ খাদ্য কী?

খ. খাদ্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন?

গ. উদ্দীপকের আলোকে ‘A’ দেশের খাদ্য অনিরাপদের দিকগুলো আলোচনা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মাধ্যমসমূহ কীভাবে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে পারে? বিশ্লেষণ করো।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে শুরু করে ডেজাল কাছে পৌছানো পর্যন্ত যে খাদ্য কোনোভাবেই দুষ্প্রিয় হয় না এবং স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঢ়ায় না তাকে নিরাপদ খাদ্য বলে।

খ খাদ্য যাতে পঁচে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

খাদ্য সংরক্ষণ বলতে বোঝায় খাদ্য যেন পঁচে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করে খাদ্যের গুণগত মান অনুসৰে খাদ্যকে বিভিন্নভাবে মজুত রাখা। খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টি উপাদানের গুণগত মান বজায় রাখা এবং খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ বহুদিনের জন্য অবিকৃত রাখাই খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। খাদ্যের অপচয় রোধ ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য খাদ্য সংরক্ষণ ও মজুত রাখা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকের ‘A’ দেশের খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি দিক (খাদ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা ও ব্যবহার) ব্যাহত হয়েছে।

সাধারণত খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে হলে খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা ও খাদ্যের ব্যবহার (পুষ্টিসম্পর্ক ও ডেজালমুক্ত) এই তিনটি দিকের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। এর যেকোনো একটি বা সবকয়টি বিস্তৃত হলে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যাহত হয় তথা খাদ্য অনিরাপদ হয়ে পড়ে। এখানে, খাদ্যের প্রাপ্যতা বলতে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ

খ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারি পদক্ষেপগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা থাকা অভ্যন্তর জরুরি। নিচে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো—

খাদ্যকে বোঝায়। আর খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা হলো খাদ্য ক্রয় করার জন্য জনগণের নিকট পর্যাপ্ত অর্থ থাকা বা দ্রব্যসামগ্রীর দাম সহনীয় মাত্রায় থাকা। আবার, খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হলে কিংবা প্রয়োজনীয় পুষ্টি খাদ্যে না থাকলে খাদ্যের ব্যবহার নিশ্চিত হয় না।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'A' দেশটিতে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর স্বল্পতা বিদ্যমান তথা পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাব রয়েছে। আবার, দেশটির জনগণ দরিদ্র হওয়ায় বলা যায় প্রয়োজনীয় খাদ্য তারা ক্রয় করতে ব্যর্থ। তার ওপর দেশটির কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অতি মুনাফার লোভে খাদ্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে থাকে। এতে খাদ্য পুষ্টিহীন ও অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ খাদ্য নিরাপত্তা ব্যাহত হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, 'A' দেশটিতে খাদ্য মারাঞ্চকভাবে অনিরাপদ হয়ে পড়ছে।

১ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দেশের সচেতন জনগণ, মিডিয়া ও সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হলো—

জনসাধারণ: সাধারণ জনগণ খাদ্যে ভেজাল মেশানো পছন্দ করে না। কিন্তু তাদের কাছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভেজাল নিরূপণকারী কিট না থাকায় খাদ্যে ভেজালের পরিমাণ জানতে পারছে না। সাধারণ জনগণ যদি এই ভেজালের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তবে অবশ্যই দেশ থেকে ভেজালের সমস্যা দূর হবে। খাদ্যে ভেজাল মেশানো যে অনৈতিক এবং দণ্ডনীয় অপরাধ তা অনেকেই জানে না। তাদেরকে এ বিষয়গুলো সাধারণ জনগণ জানাতে পারে। কেউ খাদ্যে ভেজাল মেশালে তাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দিতে পারে। ভেজালযুক্ত খাদ্য ক্রয় থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে।

মিডিয়া: মিডিয়া প্রতিটি দেশের দর্পণ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধে মিডিয়ার কার্যকারিতা অন্য যেকোনো মাধ্যম থেকে অধিক। এক্ষেত্রে খাদ্য ভেজালের কুফল বা ক্ষতিকারক দিকগুলো ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে মিডিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে।

বেসরকারি সংস্থা: স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাও খাদ্য নিরাপদকরণে ভূমিকা পালন করে আসছে। আবার, উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে এনজিওর ভূমিকাও এদেশে ব্যাপক। এসব সংস্থাগুলো বিভিন্ন দিকনির্দেশনার মাধ্যমে জনগণকে ভেজালবিরোধী আন্দোলনে সংযুক্ত করতে পারে। আবার সরকারকে ভেজালবিরোধী আইন তৈরিতে চাপও প্রয়োগ করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩ বাংলাদেশে ক্যালরিয়ুক্ত খাদ্য গ্রহণের পরিমাণভিত্তিক দারিদ্র্যের শতকরা হিসাব নিম্নরূপ:

দারিদ্র্যের ধরন	এলাকা	সময়কাল		
		১৯৮১-৮২	১৯৯১-৯২	২০১০-১১
দারিদ্র্য	পরিমাণ	৭৩.৮০	৮৭.৮০	৩৫.২০
	শহর	৬৬.০০	৪৬.৭০	২১.৩০

উক্ত দারিদ্র্য পরিস্থিতির কারণে খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা যাতে বিস্তৃত না হয় তার জন্য সরকার OMS কার্যক্রম পরিচালনা, সুলভমূল্য কার্ডের প্রচলন এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

(চ. লো. '১৭। গ্রন্থ নং ৬/

- ক. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলতে কী বোঝায়? ১
- খ. 'শুধুমাত্র খাদ্যের অবাধ সরবরাহ থাকলেই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না'— বুঝিয়ে দেখ। ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে পরিমাণ দারিদ্র্যের হারের ওপর স্তুতিচিত্র অঙ্কন করো। ৩
- ঘ. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা নিশ্চিতকরণে সরকারের পদক্ষেপসমূহ মূল্যায়ন করো। ৪

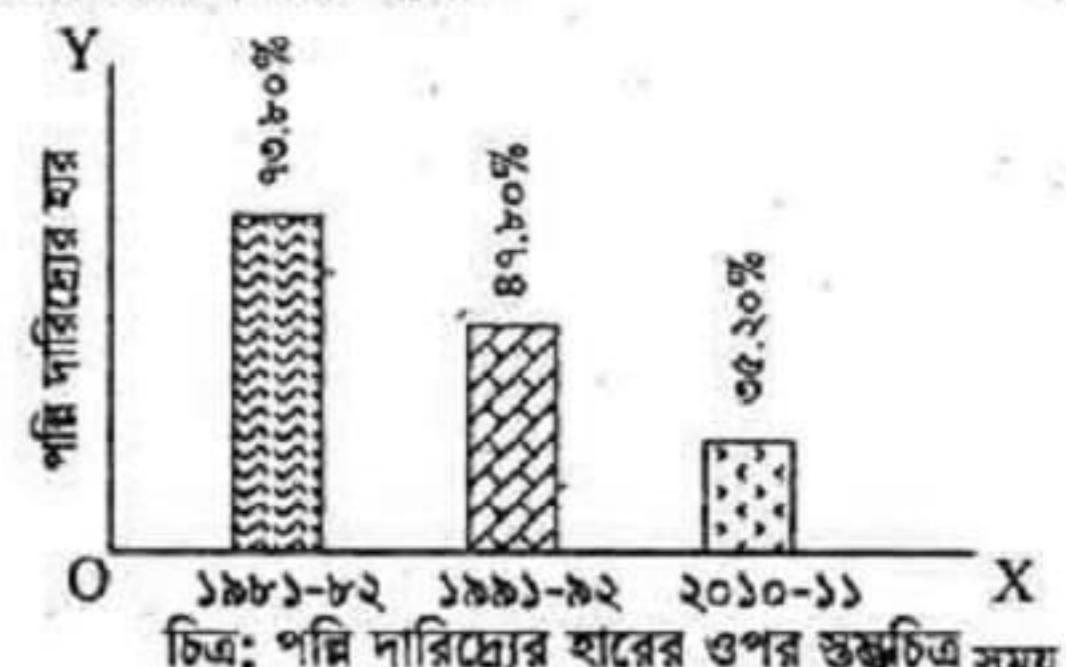
৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর, নির্দিষ্ট দামে, নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়ের যোগ্যতাকেই খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলে।

খ খাদ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা ও ব্যবহার এই তিনটি বিষয়ের ওপর খাদ্য নিরাপত্তা নির্ভর করে।

খাদ্যের প্রাপ্যতা ব্যক্তি ও পরিবারের চাহিদার প্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য প্রাপ্তিকে নির্দেশ করে। আবার, খাদ্য প্রাপ্তির নিমিত্তে পর্যাপ্ত সম্পদ হলো ক্রয়যোগ্যতা এবং মৌলিক পুষ্টি জ্ঞানের মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ হলো খাদ্যের ব্যবহার। এখন, কোনো দেশে যদি পর্যাপ্ত খাদ্য থাকে, কিন্তু তা যদি জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকে কিংবা পুষ্টি জ্ঞান অনুযায়ী তার ব্যবহার নেই, তাহলে বলা যায়, এ দেশটির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। তাই, শুধু খাদ্যের অবাধ সরবরাহ (প্রাপ্যতা) থাকলেই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না।

গ উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে নিম্নে পরিমাণ দারিদ্র্যের হারের ওপর স্তুতিচিত্র অঙ্কন করা হলো—



উপর্যুক্ত স্তুতিচিত্রের OX অক্ষে সময়কাল এবং OY অক্ষে পরিমাণ দারিদ্র্যের হার দেখানো হয়েছে। চিত্রে লক্ষ করা যায়, পরিমাণ দারিদ্র্যের হার ক্রমশ কমছে। যেখানে ১৯৮১-৮২ সালে ছিল ৭৩.৮০% সেখানে ২০১০-১১ সালে কয়েক বছরের ব্যবধানে দারিদ্র্যের হার কমে ৩৫.২০% হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা নিশ্চিতকরণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নলিখিত করা হলো—

পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য উপর্যুক্ত খাদ্য প্রাপ্তির নিমিত্তে পর্যাপ্ত সম্পদ থাকাকেই খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলে। খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার OMS (Open Market Sale) কার্যক্রম পরিচালনা, কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিথা), দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর ফলে বাংলাদেশে দরিদ্র লোকের সংখ্যা কমেছে। বর্তমানে প্রায় ২৩.৫%* লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, ১৯৮১-৮২ অর্থবছরে পরিমাণ দারিদ্র্যের হার দেখানো হয়েছে। তবে লক্ষ করা যায়, পরিমাণ দারিদ্র্যের হার ক্রমশ কমেছে। যেখানে ১৯৮১-৮২ সালে ছিল ৭৩.৮০% ও ৬৬.০০%। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে ২০১০-১১ সালে দরিদ্র লোকের সংখ্যা কমে পরিলিপিতে ৩৫.২০% এবং শহরে ২১.৩০% হয়েছে। এর ফলে জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র লোকের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে।

আবার, গত দুই দশক ধরে ভূমিহীন অদক্ষ দরিদ্র জনগণের জন্য সরকারের গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী কর্মসূচি বেশ প্রশংসিত হয়েছে। তবে, জনগণের খাদ্যের ক্রয়ক্ষমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে ত্রুটি এবং আমলাত্ত্বিক জটিলতার কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও খাদ্যে ভেজাল পরিলক্ষিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা নিশ্চিতকরণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কিছু ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেও সার্বিকভাবে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪ 'Y' দেশে ২০১৫ সালে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত মজুদ ছিল। কিছু বেকার সমস্যা ছিল প্রকট। জনগণের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না। ফলে সে সময় দেশের অনেক লোক ক্ষুধায় কষ্ট পেত। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার খাদ্য আমদানি বৃদ্ধি এবং মোবাইল কোটের মাধ্যমে ভেজালবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করে।

(চ. লো. '১৭। গ্রন্থ নং ৬/

- ক. নিরাপদ খাদ্য কী? ১
- খ. 'খাদ্য নিরাপদকরণে জনসাধারণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'Y' দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় কোন দিকটি বিস্তৃত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহের যথার্থতা ব

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে খাদ্য উৎপাদনক্ষেত্র থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌছানো পর্যাপ্ত কোনোভাবেই দৃষ্টিতে (Contaminated) হয় না এবং স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঢ়ায় না, তাকে নিরাপদ খাদ্য বলা যায়।

খ সাধারণ জনগণ খাদ্যে ভেজাল মেশানো বল্দে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

খাদ্যে ভেজাল মেশানো যে অনৈতিক এবং দণ্ডনীয় অপরাধ তা অনেকেই জানে না। তাদেরকে এ বিষয়গুলো সাধারণ জনগণ জানাতে পারে, ভেজালবিরোধী আইন প্রয়োগে সরকারকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারে। ভেজালের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সকলকে উন্মুক্ত করতে পারে। কেউ খাদ্যে ভেজাল মেশালে তাদেরকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দিতে পারে। ভেজালযুক্ত খাদ্য ক্রয় থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে।

গ 'Y' দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতার দিকটি বিস্তৃত হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন তিনটি মৌলিক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। যথা- ১. পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ, ২. খাদ্য ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও ৩. খাদ্যের সংস্থাবহার। খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতার পূর্বশর্ত খাদ্য প্রাপ্যতা। কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট দামে, নির্দিষ্ট পরিমাণ, দ্রব্য ক্রয়ের যোগ্যতাকেই খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলে। খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা অনেকটাই পরিবারের ক্রয়ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। এটি বাজারের ধরন, দাম নীতি এবং সময়সূচী বাজার অবস্থা স্থারা খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি জনসাধারণ উন্নত জীবনযাত্রায় প্রবেশ করে, তবে তাদের খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতাও উন্নতি ঘটে। খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতার অন্যতম নিয়ামক ব্যক্তির আয়। যদি ব্যক্তির আয় কম হয় তবে তার ক্রয়যোগ্যতাও কমে যায়। আবার কোনো ব্যক্তির আয়ের স্তর বৃদ্ধি পেলে তার খাদ্যের ক্রয়ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, আন্তর্জাতিক বা জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যের পর্যাপ্ত যোগান পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্যের নিরাপত্তার নিচয়তা প্রদান করে না। খাদ্য নিরাপত্তার ব্যাপারে তখনই নিশ্চিত হওয়া যায় যখন পরিবারসমূহ খাদ্য ক্রয়, বিনিয়য়, দান, খাণ কিংবা সাহায্যের মাধ্যমে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে।

উন্নীপকে লক্ষ করা যায়, 'Y' দেশে ২০১৫ সালে খাদ্যশস্যের মজুদ পর্যাপ্ত খাকলেও জনগণের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না। এর ফলে তারা প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ক্রয় করতে ব্যর্থ হয়। এ কারণে সে সময় 'Y' দেশের অনেক লোক ক্ষুধায় কষ্ট পায়।

ঘ উন্নীপকের উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহ হলো— খাদ্য আমদানি, দারিদ্র্য নিরসন এবং ভেজালবিরোধী অভিযান।

খাদ্যশস্য আমদানি: খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য চাহিদার একটি বিরাট অংশ সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত নীতিমালার মাধ্যমে প্রতি বছর আমদানি করে থাকে।

দারিদ্র্য নিরসন: দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নত খাদ্যের যোগান থাকা সঙ্গেও দেখা যায়, অনেক লোক খাদ্যাভাবে অনাহার ও অপুষ্টিতে ভুগছে। খাদ্য ক্রয়ের অক্ষমতার জন্যই এমনটি হয়। আর এজন্য দারিদ্র্যই দায়ী। তাই দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে দারিদ্র্য নিরসন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সরকারের করণীয়গুলো হলো: দেশের দারিদ্র্য লোকদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, খাস জমি বিতরণে ভূমিহীন ও প্রাণিক কৃষকদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান, দারিদ্রদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের ব্যবস্থা করা, দারিদ্রদের জন্য কর্মোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম জোরদারকরণ ইত্যাদি।

ভেজালবিরোধী অভিযান: সরকার খাদ্য নিরাপত্তা তথা ভেজাল খাদ্য দূর করার জন্য যে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ব্যবস্থা করেছে তা সব মহলে দারুণ প্রশংসিত হয়েছে। এ অভিযানটি মোবাইল কোর্ট নামে পরিচিত। খাদ্য নিরাপদকরণে এ অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের প্রয়োজন সৎ ও যোগ্য লোকের নেতৃত্বে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী অফিসারদের সাথে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ব্যবসায়ীদের যেকোনো আর্থিক সম্পর্ক যাতে না গড়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ রাখা।

প্রশ্ন ৫ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে শিক্ষক ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন, কোনো দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দক্ষতা থাকতে হবে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরই সার, বীজ, ডিজেলের মূল্য ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের ওপর যথেষ্ট ভর্তুক প্রদান করেছে। ফলে কৃষি উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্য আমদানি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। /দ্বি. ক্ষে. ১৭। প্রশ্ন নং ৫/

ক. খাদ্যের প্রাপ্যতা কী?

খ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কীভাবে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা করো।

গ. উন্নীপকের আলোকে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আর কোনো বিষয় সম্পৃক্ত করা যায় কি না উন্নীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট সময়ে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য প্রাপ্তিকে খাদ্যের প্রাপ্যতা বলে।

খ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করলে খাদ্যের ওপর চাপ ত্বাস পায়, যা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা করে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর জনসংখ্যা বাড়তে থাকলেও তার সাথে পান্না দিয়ে খাদ্যশস্যের বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেই বিদ্যমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসলে আগের থেকে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করেও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব।

গ বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো—

১. বিশ্বখাদ্য সম্মেলন ১৯৯৬ প্ররবর্তী সরকার এবং দাতাদেশ ও সংস্থা বাংলাদেশে খাদ্য নীতি প্রণয়নে উদ্যোগী হয়। সে লক্ষ্যে 'National Food Policy Plan of Action' এবং 'Investment Plan for Food Security and Nutrition' প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে সমর্থিতভাবে খাদ্য নিরাপত্তার সকল দিক; যেমন খাদ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা, উপযোগিতা বা ব্যবহার গুরুত্ব পাচ্ছে।

২. সরকার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কৌশল হিসেবে দেশীয় উৎপাদন বাড়ানোর প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে। এ লক্ষ্যে ইউরিয়া ব্যতীত সকল প্রকার সারের মূল্য অর্ধেকে কমিয়ে আনা, উচ্চ ফলনশীল বীজ সহজলভ্য করা, ডিজেলের মূল্যে কৃষককে ভর্তুক দেওয়া, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, ব্যাংক ঝল সহজ করাসহ কৃষিতে ভর্তুক বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়, এতে কৃষকরা ফসল উৎপাদনে উৎসাহী হয়।

৩. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য চাহিদার একটি বিরাট অংশ সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে, নীতিমালার মধ্য থেকে প্রতিবছর আমদানি করে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল ৪১.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন।

উন্নীপকে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে যে তথ্য ও উপাত্ত দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায়, এখানে বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা সমস্যা থাকলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে খাদ্য উৎপাদনে লক্ষণ্য বৃদ্ধি এবং সরকারের খাদ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে একেকে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ওপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও সরকার যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে তা নিম্নরূপ—

১. খাদ্যে ব্রহ্মসম্পূর্ণতা অর্জন এবং খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ লক্ষ্যে সেচ সম্প্রসারণ, জলাবন্ধন নিরসন, উন্নত মানের ও উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

২. কৃষকের চাহিদা ও বাজার চাহিদাভিত্তিক কীটপতঙ্গ, রোগবালাই মৃত্ত, খরা/লবণ্যান্তর সহিত, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী ও ব্রহ্ম সময়ে ফসল পাওয়া যায় এবং শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উভাবন ও

৩. দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদিত শস্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে শস্যমূল্য সহায়তার জন্য কৃষিবিমা এবং কৃষক পর্যায়ে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষিখাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরদিকে, এ সময়ে দুর্গত মানুষের জন্য প্রয়োজন হয় উন্নত খাদ্যশস্যের। এরূপ পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে সরকার।

৫. দেশের বিপুল সংখ্যক নিম্ন আয় ও দরিদ্র মানুষের জন্য খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। এ শ্রেণির জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যথা— ভালনারেবল গুপ ফিডিং, গ্রাটিউইটাস রিলিফ, খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি (OMS), কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন ৬ বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য বিদেশ হতে আমদানি করতে হতো। কিন্তু বিগত দশকে এই খাতের উন্নয়নের জন্য সরকার কৃষকদের মাঝে স্বল্পমূল্যে বীজ, সার, কীটনাশক বিতরণ ও ডিজেলে ভর্তুক প্রদানসহ কৃষিবান্ধব নানান কর্মসূচি গ্রহণ করায় খাদ্য উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সরকার বিদেশে চাল রপ্তানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

।/ক. বীজ কো. ১৭। গ্রন্থ নং ৭।

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কী?

খ. জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান আবশ্যক—
বুঝিয়ে বলো।

গ. উন্নীপকের আলোকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ
সরকারের গৃহীত কর্মসূচিগুলো আলোচনা করো।

ঘ. তুমি কি মনে করো উন্নীপকের গৃহীত পদক্ষেপের কারণেই
বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে?—
মূল্যায়ন করো।

৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্য নিরাপত্তা হলো এমন এক অবস্থা, যেখানে দেশের সব মানুষ সবসময় বাহ্যিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের প্রয়োজনমাফিক খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে।

খ জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যেকোনো দেশের জন্য অতি আবশ্যিক।

কোনো দেশের উৎপাদিত মোট খাদ্য দ্বারা যদি সেই দেশের সকল জনগণের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করা যায় তাহলে উৎপাদিত খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। এতে খাদ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় যা মোটেই কাম্য নয়। তাই দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে যাতে এটি প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান দিতে পারে। সুতরাং, আমদানি ব্যয় কমাতে ও দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা অতি আবশ্যিক।

গ বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উন্নীপকের আলোকে তা আলোচনা করা হলো—
খাদ্য নিরাপত্তা হলো এমন এক অবস্থা যেখানে দেশের সকল জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে খাদ্য উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করতে হয়, যাতে উৎপাদিত খাদ্য দ্বারা দেশে খাদ্যের সামগ্রিক চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মেটানো যায়।

সরকার কৃষি খাতকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কৃষিতে ভর্তুক ও সুদুর্মুক্ত খাণ এর ব্যবস্থা করে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কৃষকদের বিনামূল্যে সার ও উন্নত বীজ সরবরাহ করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের ভর্তুকিসহ কৃষিবান্ধব বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে অভিনব পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করছে। ফলে উৎপাদনশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কৃষিকে

আধুনিকায়নের জন্য তথা স্বল্প পরিমাণ জমিতে অধিক ফলনের আশায় কৃষি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এতে ফসলের উৎপাদন বেড়ে যায়। উন্নীপকের আলোকে বলা যায় যে, বিগত দশকে সরকার কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কৃষিতে ভর্তুকিসহ কৃষকদের মাঝে স্বল্পমূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ করায় পূর্বের তুলনায় উৎপাদন বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। ফলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি হ্রাস পেয়েছে। এমনকি সরকার বিদেশে চাল রপ্তানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারের এ সকল কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটলে অতিশীত্বই বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

ঘ হ্যাঁ, উন্নীপকে গৃহীত তথা কৃষিবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ করার কারণেই বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

সরকার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষিতে ভর্তুকিসহ কৃষিবান্ধব নানান ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার সাম্প্রতিক বাজেটগুলোতে কৃষিক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বরাদ্দের ব্যবস্থা করেছে। কৃষক পর্যায়ে স্বল্পমূল্যে উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি সম্প্রসারিত করতে সরকার বিনামূল্যে সহজশর্তে মৌসুমি খণ্ডসহ বিভিন্ন রকম ঝণের ব্যবস্থা করেছে। কৃষি আধুনিকায়নের জন্য সরকার নানা রকম কৃষি যন্ত্রপাতি অতি স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করছে এবং কৃষক সম্প্রদায় যাতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফলন বৃদ্ধি করতে পারে সে জন্য প্রত্যেক গ্রামে কৃষি অধিদপ্তর থেকে কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারি উদ্যোগে খামার তৈরি করাকে সরকার বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। এতে পূর্বের তুলনায় খাদ্য উৎপাদন বহুগুণে বেড়েছে। ফলে আমদানির পরিমাণ অনেকখানি কমে গিয়েছে এবং বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

উন্নীপকের আলোকে বলা যায় যে, বিগত দশকে কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য সরকার কৃষকদের মাঝে স্বল্পমূল্যে বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদিতে ভর্তুক প্রদান করে আসছে। তাছাড়া বিভিন্ন কৃষিবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে ও আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার বিদেশে চাল রপ্তানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সুতরাং, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসনীয়।

প্রশ্ন ৭ জানুয়ারি মাসের ১ম সপ্তাহে মিনিল স্যার ঢাকা থেকে গাজীপুরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিতে যাওয়ার সময় ব্যাগে কিছু নাস্তা ও দুইটি কমলা নিয়ে যান। পথিমধ্যে নাস্তা ও একটি কমলা খেলেও তুলক্ষণে ব্যাগে একটি কমলা থেকে যায়। প্রায় একমাস পর ব্যাগ পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখেন ব্যাগের কমলাটি না পেচে প্রায় পূর্বের মতোই রয়েছে।

।/ক. ডেজাল খাদ্য কী?

১
খ. খাদ্য প্রাপ্যতাই কি খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট?

গ. মিনিল স্যারের ব্যাগের কমলাটি পূর্বের ন্যায় থাকল কীভাবে?
ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উন্নীপকের ঘটনা নিরাপদ খাদ্য ধারণাকে সমর্থন করে কি?
তোমার মতামত দাও।

৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক খাদ্যের সাথে অন্য খাদ্যের সংমিশ্রণ, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন রাসায়নিক পদার্থ খাদ্যে মিশ্রণ, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি একত্রে খাদ্যে ডেজাল বা ডেজাল খাদ্য বলে পরিচিত।

খ খাদ্য প্রাপ্যতাই খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়।
খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা এবং খাদ্যের সম্ব্যবহার- খাদ্য নিরাপত্তার এসব দিক এককভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। খাদ্যের প্রাপ্যতা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও যদি পরিবারের খাদ্যের ক্ষয় যোগ্যতা না থাকে বা পরিবারের খাদ্য ক্রয়যোগ্যতা আছে কিন্তু ডেজালমুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা নেই, তাহলেও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য খাদ্যের প্রাপ্যতা প্রয়োজনীয় হলেও পর্যাপ্ত নয়।

গ উদ্বীপকটি থেকে জানা যায়, প্রায় এক মাস পরেও মিমিলুল স্যারের কেন্দ্র কমলাটি আগের মতোই আছে; অর্থাৎ তা না পঁচে তাজা কমলার মতোই দেখাচ্ছে। এক মাস পরেও কমলাটি সতেজ দেখতে পাওয়ার বিষয়টি ভেজাল খাদ্যকে নির্দেশ করে। নিচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো—
বর্তমানে বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য-চাহিদার তুলনায় তার যোগান অপ্রতুল। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে খাদ্যের দাম ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে খাদ্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পরিবহন ও সংরক্ষণজনিত সমস্যা। এ পরিস্থিতিতে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিক্রয় ও পরিবেশন একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এখন তাই বিভিন্নভাবে ভেজাল খাদ্য তৈরি হচ্ছে। কমলালেবু, পেপে, আপেল, পাকা আম ইত্যাদি সতেজ রাখার জন্য ফরমালিন ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু তাই-ই নয়, কলা মুত্ত পাকাতে ইথিন, মিষ্টিতে স্যাকারিন, শুটকি মাছে কীটনাশক ও ডিভিটি, দুধের সাথে পানি ও পাউডার এবং জুস ও জেলির সাথে বিষাক্ত রং ব্যবহার করা হচ্ছে। এভাবে দেখা যায়, শিশুখাদ্য থেকে শুরু করে ফলমূল, শাক-সবজি, মাছ-মাংস, দুধ, মিষ্টি, প্যাকেটজাত খাদ্যসহ প্রায় সব ধরনের খাবারে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয়।

সুতরাং বলা যায়, খাদ্যে ভেজাল বা ভেজাল খাদ্যের হাত ধরেই মিমিলুল স্যারের ব্যাপের কমলাটি আগের মতোই রয়েছে।

ঘ উদ্বীপকের ঘটনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আজকাল বাংলাদেশে শিশুখাদ্য থেকে শুরু করে ফলমূল, শাক-সবজি, মাছ-মাংস, দুধ, মিষ্টি, প্যাকেটজাত খাদ্যসহ প্রায় সব ধরনের খাবারে নানা রকম বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয়। ফলে প্রায় সব ধরনের খাদ্যই ভেজালযুক্ত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে আমরা প্রায় সবাই পেটে নানা ধরনের পীড়া, শরীর ক্রমেই দুর্বল ও কৃশ হয়ে যাওয়া, স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়া, শারীরিক ওজন অত্যন্ত কম বা বাড়া, চুল পড়া, মানসিক অবসাদ, অতিরিক্ত ক্রান্তি ইত্যাদি অসুখে ভুগছি। এসবই ভেজাল খাদ্যের কুফল বলা যায়। এরূপ অবস্থা আমাদেরকে এমন খাদ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা ভেজালমুক্ত অর্থাৎ নিরাপদ।

যে খাদ্য উৎপাদনক্ষেত্র থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌছানো পর্যন্ত কোনোভাবেই দূষিত হয় না এবং স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না তাকে নিরাপদ খাদ্য বলা যায়। ভেজাল খাদ্যের কথা উঠলেই নিরাপদ খাদ্যের কথা মনে হয়।

নিরাপদ খাদ্য মানুষকে সুস্থি-সবল রাখে ও তার আয়ুর্বকাল বাড়ায়। এ খাদ্য গ্রহণের ফলে তাই ব্যক্তি ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটে। এর ফলে মানুষ জীবনের বেশিরভাগ সময় কর্মক্ষম থাকে ও তার উৎপাদনশীলতা বাড়ে। নিরাপদ খাদ্য পুষ্টি সম্মিলিত হয়। খাদ্য নিরাপদ করতে পারলে তাই তা থেকে পুষ্টি আহরণ সম্ভব হয়। যা দেহ ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটায়। নিরাপদ খাদ্যের পুষ্টিমানের তারতম্য ঘটে না। যথার্থে তাপমাত্রা ও পরিবেশে খাদ্য সংরক্ষণ করলে তার পুষ্টিমান বজায় থাকে। খাদ্য নিরাপদ করতে পারলে তাই তা থেকে তাজা খাবারের মতোই পুষ্টি প্রাপ্তি সম্ভব।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্বীপকের ঘটনা নিরাপদ খাদ্য ধারণাকে সমর্থন করে।

প্রশ্ন ▶ ৮ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্ঘেস্থির পাশাপাশি কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে নানা রকম কারণে মানুষ নদীর বাঁধ এবং পাকা সড়কের ওপরে আশ্রয় নেয়। রাসায়নিকের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। সরকার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছে। /সি. লে. ১৭। গ্রন্থ নং ৫/

- ক. নিরাপদ খাদ্য কী? ১
- খ. মজুদের ওপর খাদ্য নিরাপত্তা নির্ভর করে, ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. খাদ্য নিরাপত্তা বিস্তৃত হওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী করা উচিত বলে তুমি মনে করো? ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে খাদ্য উৎপাদনক্ষেত্র থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌছানো পর্যন্ত কোনোভাবেই দূষিত (Contaminated) হয় না এবং স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না, তাকে নিরাপদ খাদ্য বলা যায়।

খ একটি দেশের সার্বিক প্রাপ্ত্যতা তথা খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে খাদ্য মজুদের ভূমিকা অপরিসীম।

খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম অভ্যাস্যক দিক হলো খাদ্যের প্রাপ্ত্যতা। আর এই প্রাপ্ত্যতাকে পর্যাপ্ত রাখার জন্য প্রয়োজন খাদ্য মজুদ রাখা। এর ফলে আপদকালীন খাদ্য ঘাটতি ঘোকাবিলো করা যায়। মূলত সরকারের অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ আমদানি এবং খাদ্য সাহায্যকে অবলম্বন করে খাদ্যের মজুদ গড়ে উঠে। যেমন— বাংলাদেশে সরকার প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য মজুদ রাখে। যা দেশের খাদ্যের প্রাপ্ত্যতা তথা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

গ খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান তিনটি দিক হলো— খাদ্যের প্রাপ্ত্যতা, খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা ও খাদ্যের ব্যবহার। এর যেকোনো একটি দিক নিশ্চিত না হলেই খাদ্য নিরাপত্তা বিস্তৃত হয়। সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য প্রাপ্তিকে খাদ্যের প্রাপ্ত্যতা বলে। প্রাকৃতিক দুর্ঘেস্থির কারণে মোট দেশজ উৎপাদন কম হলে সরকার দেশের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুদ করতে ব্যর্থ হয়। এতে খাদ্য নিরাপত্তা বিস্তৃত হয়।

আবার, পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য উপযুক্ত খাদ্য প্রাপ্তির নিমিত্তে পর্যাপ্ত সম্পদ থাকাকে খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলে। খাদ্য নিরাপত্তা তখনই নিশ্চিত হবে, যখন দেশের প্রতিটি পরিবার বা ব্যক্তির হাতে পুষ্টিকর এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য ক্রয়ের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বা অর্থ থাকবে। দেশে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, নিম্ন আয় ইত্যাদি কারণে জনগণ প্রয়োজনীয় খাদ্য ক্রয় করতে না পারলে খাদ্য নিরাপত্তা বিস্তৃত হয়। তাছাড়া, খাদ্যে ভেজাল, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ (যেমন ফরমালিন) এর ব্যবহার নিম্ন পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন ইত্যাদি কারণেও খাদ্য নিরাপত্তা বিস্তৃত হয়।

ঘ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার কঠোর ও জনগণ সচেতন হলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এদের ভূমিকা আলোচনা করা হলো—

১. **সরকারের করণীয়:** খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের কোনো পর্যায়েই যাতে দূষিত না হয়, তা সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে মজুদ ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে। দরিদ্র ও প্রাপ্তিক কৃষকদের প্রয়োজনীয় খণ্ড ও সাহায্য প্রদান করে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে খাদ্য ভেজালবিরোধী অভিজান জোরদার ও কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে। টিসিবির মাধ্যমে শুধু লাইসেন্সধারীদের নিকট ফরমালিন বিক্রি নিশ্চিত করতে হবে। ভেজাল খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য দণ্ডনামের ব্যবস্থা ও দ্রষ্টব্যসমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে।

২. **জনগণের ভূমিকা:** খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জনগণকে ভেজাল ও অনিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। ভেজাল খাদ্য গ্রহণে ক্ষতিকর দিক ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের উপকারিতা সম্পর্কে জানতে হবে। খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদক ও বিক্রেতাদেরকে সাময়িক লাভের আশায় ভেজাল খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রি করা হতে বিরত থাকতে হবে। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে দেশের স্বার্থে খাদ্যে ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের বিষয়ে নিয়মিত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান, বিজ্ঞাপন ও তথ্যচিত্র প্রচার করতে হবে। উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হলে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৯ বাংলাদেশে কৃষিতে নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। হাওর, বাঁওড় ও উপকূলীয় এলাকায়ও এখন ধান চাষ হচ্ছে। সার, বীজ ও আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে খাদ্য ঘাটতি অনেক কমেছে। এ ছাড়াও সরকার খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্যশস্য আমদানি, আপদকালীন মজুদ ও কৃষি গবেষণার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। /সি. লে. ১৭। গ্রন্থ নং ৫; জ. আকুর রাজ্জক মিডিনিসিপ্যাল কলেজ, ঢাক্কা।

- ক. খাদ্য নিরাপত্তা কী? ১
- খ. খাদ্য প্রাপ্ত্যতাই কি খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্বীপকের আলোকে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করো। ৩
- ঘ. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী করা উচিত বলে তুমি মনে করে? ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. খাদ্য নিরাপত্তা এমন এক অবস্থাকে নির্দেশ করে, যেখানে দেশের সব মানুষ সবসময় বাহ্যিক ও অথনেটিক দিক থেকে তাদের প্রয়োজনমতো খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে।

খ. খাদ্য প্রাপ্যতাই খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়।

খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা এবং খাদ্যের সম্বৰহার। খাদ্য-নিরাপত্তার এসব দিক এককভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। খাদ্যের প্রাপ্যতা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও যদি পরিবারের খাদ্যের ক্রয় যোগ্যতা না থাকে বা পরিবারের খাদ্য ক্রয়যোগ্যতা আছে কিন্তু ভেজালমুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা নেই, তাহলেও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না।

গ. উদ্দীপকে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করা হলো—

১. বাংলাদেশে কৃষি জমির পরিমাণ নিতান্তই সীমিত। তাই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের উদ্দেশ্যে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চামের জমির আওতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকার দেশের হাওর-বাঁওড়, পানি নিষ্কাশন ও পানিসেচের ব্যবস্থা এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় জমির লবণাক্ততা দূর করে কৃষি জমির আওতা বৃদ্ধি করেছে।

২. খাদ্যোৎপাদন সম্পূর্ণভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ এবং কৃষিক্ষেত্রের আওতা বৃদ্ধি ও প্রাপ্তি সহজীকরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার দেশে ১.৪ কোটি কৃষক পরিবারের মধ্যে উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করেছে।

৩. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযান জোরদার ও খাদ্য আমদানির পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের-জন্য এবং আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে সরকার বর্তমানে প্রতিবছর গড়ে ১০ লক্ষ মে. টন খাদ্য মজুদ করে।

৪. কৃষকের চাহিদা ও বাজার চাহিদাভিত্তিক কীটপতঙ্গ, রোগবালাই মুক্ত, খরাসহিক্ষু আবহ্যয়া ও পরিবেশ উপযোগী শস্যের জাত ও প্রযুক্তির উন্নয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরমাণু ও বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং স্বল্পসময়ের শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে উপরিউক্ত কর্মসূচিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে আরো যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সেগুলো নিম্নরূপ—

১. ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক মূলক চাষাবাদের পরিবর্তে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ করা প্রয়োজন। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খাদ্যের উৎপাদন শুরু করলে দেশে সার্বিকভাবে খাদ্যের যোগান বাড়বে।

২. খাদ্যের যোগান বিপুলভাবে বৃদ্ধির জন্য কৃষি-উৎপাদন কৌশলের যুগোপযোগী পরিবর্তন আবশ্যিক। এক্ষেত্রে শস্যের ক্রমাবর্তন, বহুমুখী শস্যোৎপাদন বিন্যাস ইত্যাদি চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে।

৩. খাদ্যের সার্বিক যোগান বাড়ানোর জন্য ভূট্টা, আলু, ডাল, তেলবীজ, শাক-সবজি, ফলমূল, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদিও অধিক পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলোর উৎপাদন বাড়লে জনসাধারণের খাদ্যের মানও উন্নত হবে।

৪. খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের ছারাও খাদ্য-চাহিদার সাথে খাদ্যের যোগানের সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। ভাত ও রুটির সাথে বেশি পরিমাণে আলু, সবজি ইত্যাদি গ্রহণ করলে চাল ও গমের চাহিদা কমবে এবং তার যোগান চাহিদার সাথে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

৫. দেশে খাদ্যের যোগান বাড়াতে হলে কৃষকদের খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উৎপাদনের উন্নাবিত নবতর উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। একই সাথে উৎপাদিত খাদ্য দেশে-বিদেশে যাতে প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রি করা যায় তারও ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজে তথ্য ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করা যায়।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপ ছাড়াও উপরিউল্লিখিত পদক্ষেপগুলোও প্রয়োগযোগ্য।

প্রশ্ন ১০ বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। দেশটি কৃষিপ্রধান হলেও খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ফলে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার। ভূমিহীন ক্রষকের ব্যাপক উপস্থিতি, বর্ণাচাষ প্রথা, খাদ্য গুদামজাতকরণের অভাব, অধিক পরিবহণ ব্যয় ইত্যাদি কারণে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সরকার টেকসই কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, অচিরে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

ব. লে. ১৭। প্রশ্ন নং ১০।

ক. ভেজাল খাদ্য কী?

১

খ. নিরাপদ খাদ্য প্রয়োজন কেন?

২

গ. খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার কারণগুলো উদ্দীপকের আলোকে চিহ্নিত করো।

৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপ ছাড়া খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সরকার আরো কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? মতামত দাও।

৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. এক খাদ্যের সাথে অন্য খাদ্য মিশ্রণ, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণ, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি একত্রে খাদ্যে ভেজাল বা ভেজাল খাদ্য বলে পরিচিত।

খ. খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খাদ্যের প্রাপ্যতা ও ক্রয়যোগ্যতা নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে তা নিরাপদ করাও প্রয়োজন।

নিরাপদ খাদ্য মানুষকে সুস্থ সবল রাখে; ফলে সে জীবনের বেশির ভাগ সময় কর্মসূচি থাকে। খাদ্য নিরাপদ হলে রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং কর্মসূচি থাকা সম্ভব হয়। নিরাপদ খাদ্য পুষ্টিসমূহ হয় বলে তা থেকে পুষ্টি আহরণ সম্ভব হয় যা দেহ ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটায়। তাই খাদ্য নিরাপদ হওয়া আবশ্যিক।

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার জন্য কিছু কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

১. বাংলাদেশে ভূমিস্থ প্রথার বড় একটি ত্রুটি হলো— কৃষিখাতে ভূমিহীন ক্রষকের অস্তিত্ব। ত্রুটিপূর্ণ ভূমিস্থ ব্যবস্থার কারণে এদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কৃষকই ভূমিহীন। তারা খাদ্যশস্য বা অর্ধের বিনিময়ে অন্যের জমি চাষ করে। চাষকৃত জমি নিজেদের না হওয়ায় তারা পূর্ণ উদ্যমের সাথে কৃষিকাজ করে না। ফলে ফলন কম হয়। এ অবস্থায় খাদ্যের প্রাপ্যতা বাড়ে না এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করে।

২. বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বর্ণাচাষ প্রথা প্রচলিত আছে। এখানে চাষকৃত জমি বর্ণাচাষির না হওয়ায় এবং জমির মালিক কর্তৃক যেকোনো সময়ে জমি থেকে উৎখাত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না। এজন্য খাদ্য প্রাপ্তির পরিমাণ তেমন বাড়ে না।

৩. বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে খাদ্য গুদামজাতকরণের পর্যাপ্ততা নেই। খাদ্য গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণের অভাবে তা ঠিকমতো ও পর্যাপ্ত পরিমাণে গুদামজাত করা যায় না। সংরক্ষণজনিত ত্রুটির জন্যও গুদামজাতকৃত খাদ্যের একাংশ বিনষ্ট হয়।

৪. সাম্প্রতিক সময়ে ডিজেল ও গ্যাসের দাম অনেক বেড়ে যাওয়ায় পরিবহণ ভাড়াও যথেষ্ট বেড়েছে। ফলে সব জায়গায় খাদ্যের যোগান ঠিকমতো দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম দিক হলো খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি। উপরে উল্লিখিত কারণগুলোর জন্য তা বিন্নিত হওয়ায় দেশে এখনও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে।

ঘ. সাম্প্রতিককালে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য সরকার টেকসই কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সরকারের এ পদক্ষেপ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য যথেষ্ট নয়; এ ব্যাপারে আরো কিছু করণীয় আছে। এগুলো নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল

২. বাংলাদেশে যেহেতু নামা সীমাবদ্ধতার কারণে হঠাতে করে খাদ্যেৎপাদন বিপুল পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব নয়, তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেই বিদ্যমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার কর্তৃক পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত করতে পারলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসবে।

৩. দেশে খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে হলে কৃষকদের খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উৎপাদনের উভাবিত নতুন নতুন উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। একই সাথে উৎপাদিত খাদ্য দেশে-বিদেশে যাতে প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রি করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। একেতে আইসিটি মারফত কৃষকরা তাদের কম্পিউটারের সাহায্যে ঘরে বসেই আবহাওয়া, কৃষি উৎপাদন ও চাষাবাদের নতুন নতুন কৌশল, উভাবিত পরিপূর্ণিকরণ ও পানির ব্যবহার, কৃষিপণ্যের চাহিদা, বিদ্যমান দাম, পশু-পাখির রোগ ও তার প্রতিবেধক ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

সুতরাং, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ হাজার সরকার উপরিউল্লিখিত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন নিশ্চিত করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১১ বাংলাদেশের কৃষিতে নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উভাবনের ফলে উপকূলীয় এলাকা ধান চাষের আওতায় এসেছে। মুতু বর্ধনশীল শস্যের জাত উভাবনের ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মজ্জা দূর হয়েছে। আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও সরকার খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্যশস্য আমদানি, অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও কৃষি গবেষণার উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

জ. কো. ১৬। গ্রন্থ নং ৩।

ক. নিরাপদ খাদ্য কী? ১

খ. বাংলাদেশের কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বাঢ়ছে— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে যে সকল কর্মসূচির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নিরাপদ খাদ্য কর্মসূচির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌছানো পর্যন্ত যে খাদ্য কোনোভাবেই দূষিত হয় না এবং স্বাস্থ্যের জন্য তুষকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না, তাকে নিরাপদ খাদ্য বলে।

ক. সম্প্রতি বাংলাদেশের কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বাঢ়ছে।

কৃষিতে পরমাণু ও জৈব প্রযুক্তি ব্যবহৃত হওয়ায় কৃষি প্রযুক্তির ধারণা বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে পরমাণু শক্তি ও জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারে শস্যের মানোন্নয়ন, নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল ও কীটপতঙ্গ প্রতিরোধক বীজ উভাবন, রোগ প্রতিরোধক ও উৎপাদনক্ষম গবাদিপশু ও পাখি প্রজননকেন্দ্র স্থাপন, ভূমির উর্বরতা সংরক্ষণ ইত্যাদি কৃষি প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

গ. উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধানের জাত, কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার, খাদ্যশস্য আমদানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১. খাদ্য প্রাপ্যতার প্রেক্ষিতে দেশজ উৎপাদনই প্রধান নিয়ামক। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্যের যোগান একটি সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ। তবে খাদ্য ঘাটতির কারণে অনেক সময় খাদ্য আমদানি করতে হয়। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হিসেবে দাবি করা হয়েছে। বড় ধরনের দুর্বোগে না পড়লে খাদ্য ঘাটতি তেমন দেখা দেয় না। তথাপি প্রতি বছর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য আমদানিকৃত খাদ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়।

২. পরমাণু ও প্রাণ-প্রযুক্তি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী এবং স্বল্পসময়ে (সর্বোচ্চ ১১০ দিন) ফসল পাওয়া যায় এবং শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উভাবন ও মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করছে। সাথে সাথে তথ্য প্রযুক্তির মারফতে কৃষকরা তাদের ঘরে বসেই আবহাওয়া, কৃষি উৎপাদন ও চাষাবাদ কৌশল, উভাবিত পুষ্টি উপকরণ, উভাবিত নতুন নতুন বীজ ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারে।

৪. অভ্যন্তরীণ সংগৃহীত কিংবা আমদানিকৃত খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যগুদাম থাকা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকার খাদ্যগুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গৃহীত কর্মসূচি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের আয়তনে ৯০তম রাষ্ট্র হলেও জনসংখ্যার দিক দিয়ে অক্টম স্থানের অধিকারী। ২০১৭ সালের তথ্য মতে, এদেশের মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৮৯ লক্ষ। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদানের। এসব পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহের জন্য যেসব ব্যবস্থা বর্তমান বাংলাদেশে গৃহীত হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয় দাবিদার।

এতদসত্ত্বেও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এখনো গৃহীত হয়নি। এখনো অনেক মানুষ নিরাপদ পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত। প্রায় ২০.৫% মানুষ এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। একজন সুস্থি-সবল মানুষের জন্য দৈনন্দিক ২২০০ ক্যালরিয়ান্ট খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে শতকরা কতজনের ভার্গে তা জোটে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা সুবিধাভোগীদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। অন্যদিকে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম অনেক বেশি। যা দিন দিন দরিদ্র জনগোষ্ঠী হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

তবে আশাৰ কথা বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে যে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, আগামী দিনগুলোতে এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে অটীরেই বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটাতে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের আমদানি ও উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সার্বিক উন্নয়নে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কৃষিখাতে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য উৎপাদনের ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের পক্ষে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ১২ মুদ্রাস্ফীতির হার ও মজুরি সূচক পরিবর্তনের হার:

বিষয়	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
মুদ্রাস্ফীতির হার	১৬.৭২	৭.৯১	৬.২৫	১৪.১১	৭.৭২	৫.২২
মজুরি সূচক পরিবর্তনের হার	১১.৮৫	১৮.৯০	৮.১৬	৭.২৪	১১.৮৯	১৪.৭৩

কাশেম স্যার ক্লাসে এসেই উপরের টেবিলটি একে তথ্যসমূহ লিখলেন। এরপর ছাত্রদের দৃষ্টি টেবিলের দিকে আকৃষ্ট করে খাদ্য নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক আলোচনা করলেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষিতে ভর্তুক প্রদান, গবেষণা জোরদার, ফসলের ন্যায়মূল্য নিশ্চিতকরণ, তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণসহ নানাবিধি কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

ক. খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কী বোঝ? ১

খ. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাধারণ ভোক্তা কী ভূমিকা পালন করতে পারে? ২

গ. উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তায় খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা সম্পর্কে কী ধরনের নির্দেশনা পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোন ধরনের কার্যক্রমের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া দরকার তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্য নিরাপত্তা এমন এক অবস্থাকে নির্দেশ করে, যেখানে দেশের সব মানুষ সব সময় বাহ্যিক বা অথনেটিক দিক থেকে তাদের প্রয়োজনমাফিক খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে।

খ খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে বা খাদ্য নিরাপদকরণে জনসাধারণের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের জনগণ অশিক্ষিত, অসচেতন, স্বল্প শিক্ষিত। তাই এসব দেশে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জনগণের কর্তৃত্বের থাকে দুর্বল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। দরিদ্র দেশের জনগণের এই অসচেতনতাকে পুঁজি করে অতিমুনাফালোভী, অসৎ ব্যবসায়ীরা আঙুল ফুলে রাতারাতি কলাগাছ হতে চায়। এমতাবস্থায় সাধারণ জনগণ সরকারের পাশাপাশি ভেজালবিরোধী সভা, সেমিনারের ব্যবস্থা, ভেজালবিরোধী অভিযানে সহযোগিতা করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

গ উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তায় খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

উল্লিখিত সূচিতে লক্ষ করা যায়, মানুষের মজুরি হারের অধিক পরিবর্তন হলেও মুদ্রাস্ফীতির হার বিগত সালের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ১৬.৭২% যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে এসে কমে গিয়ে ৫.২২%-এ দাঁড়িয়েছে। এতে করে মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনগণ কম পরিমাণ অর্থ নিয়ে অধিক পণ্য ক্রয় করতে পারবে।

অন্যদিকে, মজুরির হার ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ১১.৮৫% যা বেড়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে এসে ১৪.৭৩%-এ দাঁড়িয়েছে। এর মাধ্যমে বোৰা যায়, জনগণের মজুরি বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের ক্রয়ক্ষমতা এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির ফলে তাদের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং অধিক অর্থ খরচ করেও পণ্য ক্রয় করতে পারবে। দেশে একই সাথে মুদ্রাস্ফীতির হার হ্রাস পেলে এবং মজুরির হার বৃদ্ধি পেলে জনগণের জীবনমাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। একই সাথে তারা প্রয়োজনমতো উপযুক্ত খাবার গ্রহণ করে উৎপাদনশীল জাতি হিসেবে গড়ে উঠবে এবং তাদের পরিবার সঠিক খাদ্য বা পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে। খাদ্য নিরাপত্তা ধারণায় সমাজের সকল মানুষের খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমেই এটির পূর্ণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে যা উদ্দীপকের তথ্যে প্রতীয়মান হয়েছে।

ঘ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারের ভূমিকাই অগ্রগণ্য বলে আমি মনে করি।

এদেশের অধিকাংশ কৃষক অসচেতন। তারা অনেক সময় মূলধনের অভাবে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করতে পারে না। তাই, সরকার বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিনা শর্তে বা স্বল্প শর্তে ঝণ সহায়তা ও ভর্তুকি প্রদান করতে পারে।

সরকার নিরাপদ খাদ্যের নিষ্যতা বিধানে দেশে বিদ্যমান পলিসি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। নিরাপদ খাদ্যের নিষ্যতার লক্ষ্যে প্রচলিত আইনের সংশোধন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, পঞ্চবার্ষিক ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, স্বাস্থ্য সচেতনতার লক্ষ্যে শিক্ষার কারিকুলাম, স্বাস্থ্যনীতিমালা, পুষ্টি বিভাগ এসবের মধ্যে নীতিগত সামঞ্জস্য আনতে পারে। নিরাপদ খাদ্যের নিষ্যতা বিধানে সরকার তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছে। উৎপাদিত বা সরবরাহকৃত খাদ্যদ্রব্যের গুণগতমান যাচাইকরণ, কারখানায় নজরদারি বাড়ানো, ফরমালিন ও কেমিক্যালযুক্ত ভেজাল খাদ্যদ্রব্য যাতে বিক্রি করতে না পারে সেজন্য সরকার নানামূর্বী উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া সরকার জনসাধারণকে সচেতন করতে টেলিভিশন ও পত্রিকার মাধ্যমে এবং পাঠ্যবইয়ের সিলেবাসে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সংযুক্ত করে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারের ভূমিকাই প্রধান, তবে খাদ্য নিরাপদকরণে জনসাধারণ ও বেসরকারি সংস্থাগুলোরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন ১৩ এক সময় বাংলাদেশ খাদ্য ঘাটতির দেশ ছিল। প্রতি বছরই ১৫ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করতে হতো। ইদানীং সরকার কৃষকদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে খাদ্য উৎপাদন পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে। ফলে খাদ্য ঘাটতি দূর হয়েছে।

।/দ্বি. লে. ১৬। প্রশ্ন নং ১/

ক. খাদ্যের প্রাপ্ত্যতা বলতে কী বোঝায়?

১

খ. নিরাপদ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।

২

গ. উদ্দীপকের আলোকে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপমূহু আলোচনা করো।

৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি পদক্ষেপ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম— উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নিদিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিদিষ্ট সময়ে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য প্রাপ্তিকে খাদ্যের প্রাপ্ত্যতা বলে।

খ খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খাদ্যের প্রাপ্ত্যতা ও ক্রয়যোগ্যতা নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে তা নিরাপদ করাও অত্যাবশ্যকীয়।

নিরাপদ খাদ্য মানুষকে সুস্থ সবল রাখে; ফলে সে জীবনের বেশির ভাগ সময় কর্মক্ষম থাকে। খাদ্য নিরাপদ হলে রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং কর্মক্ষম থাকা সম্ভব হয়। নিরাপদ খাদ্য পুষ্টিসমৃদ্ধ হয় বলে তা থেকে পুষ্টি আহরণ সম্ভব হয় যা দেহ ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটায়। তাই খাদ্য নিরাপদ হওয়া প্রয়োজন।

গ সরকার অনেক আগে থেকেই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে তৎপর রয়েছে। এদেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিগুলো নিম্নরূপ:

১. জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব একটি কৃষিব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট।

২. বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষি ও পরি উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

৩. খাদ্যোৎপাদন লক্ষণভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুক বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা এবং কৃষিখাগণের আওতা বৃদ্ধি ও প্রাপ্তি সহজীকরণ করা হয়েছে।

৪. খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ, জলাবন্ধন নিরসন, উন্নতমানের ও উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. পরমাণু ও প্রাণ-প্রযুক্তি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী এবং স্বল্পসময়ে (সর্বোচ্চ ১১০ দিন) ফসল পাওয়া যায় এবং শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উত্তোলন ও মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

৬. সরকার পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তা দিচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি পদক্ষেপ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

প্রথমত, খাদ্যশস্য উৎপাদনে নানামূর্বী কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে এর উৎপাদন দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছিল ৩৮৯.৯৭লক মেট্রিক টন। আর ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৩৯৬.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন। আর ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৩৯৬.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন; যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সরকার প্রতিবছর খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারিভাবে মোট খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ১৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা সংশোধিত ছিল ১৬.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন।

তৃতীয়ত, খাদ্য ঘাটতির কারণে অনেক সময় খাদ্য আমদানি করতে হয়। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হিসেবে দাবি করা হয়েছে। তবে বড় ধরনের দুর্ঘাগে না পড়লে খাদ্য ঘাটতি তেমন দেখা দেয় না। তথাপি প্রতি বছর দেশে বেশ কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়ে থাকে। এটি করা হয় খাদ্যভিত্তিক বিভিন্ন

চতুর্থত, দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেন খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে সে জন্য সরকার 'পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম' বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এর আওতায় ওএমএস, ফেয়ার প্রাইস কার্ড, ৪৮ শ্রেণি কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা, পার্মেন্টস শ্রমিক ও অন্যান্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী থাতে কাবিখা, টিআর, ডিজিএফ, ডিজিডি, জিআর ও অন্যান্য। গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৮.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৩.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ 'ক' দেশের জনগণ দরিদ্র, উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রীও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এছাড়া দেশে প্রতিবছর বন্যা ও ঘৃণিঝড়ের ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। কিন্তু উক্ত দেশের জনগণ অতি মুনাফালোভী। শাকসবজি, ফলমূল সংরক্ষণে ক্ষতিকর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ ঘটায়। এরূপ ভেজাল খাবার থেকে দেশের যুবসমাজের স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন। দেশের খাদ্য নিরাপত্তার এরূপ পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এবং এনজিওরা সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং সরকারও এ ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

/ক. রো. ১৬। প্রশ্ন নং ৬/

ক. খাদ্যের প্রাপ্যতা কী?

১

খ. বৈদেশিক বাণিজ্য স্বারা খাদ্যের প্রাপ্যতা কীভাবে প্রভাবিত হয়? ২

গ. উদ্বিপক অনুসারে 'ক' দেশের খাদ্য নিরাপত্তার দিকগুলো চিহ্নিত করো।

৩

ঘ. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেসরকারি সংস্থা ও জনগণের কী ভূমিকা হওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর?

৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট সময়ে অভ্যাবশ্যকীয় খাদ্য প্রাপ্তিকে খাদ্যের প্রাপ্যতা বলে।

খ খাদ্য প্রাপ্যতার প্রেক্ষিতে দেশজ উৎপাদনই প্রধান নিয়ামক হলেও খাদ্য ঘাটতির কারণে অনেক সময় বৈদেশিক বাণিজ্য স্বারা খাদ্য আমদানি করতে হয়।

বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হিসেবে দাবি করা হয়েছে। বড় ধরনের দুর্যোগে না পড়লে খাদ্য ঘাটতি তেমন দেখা দেয় না। তথাপি প্রতি বছর দেশে বেশ কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়। এটা করা হয় খাদ্যভিত্তিক বিভিন্ন সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা, দুর্যোগকালীন জরুরি প্রয়োজন মেটানো এবং খাদ্যশস্যের প্রয়োজনীয় ও নিরাপত্তা মজুত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, যা খাদ্য প্রাপ্যতার দিকটি নিশ্চিত করে।

গ উদ্বিপক অনুসারে 'ক' দেশের খাদ্য নিরাপত্তার প্রতিবন্ধিক হিসেবে ভেজাল খাদ্যের দিকগুলো ফুটে উঠেছে।

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে হলে জনসাধারণের ভেজালমুক্ত খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য। এক খাদ্যের সাথে অন্য খাদ্যের মিশ্রণ, খাদ্য স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণ, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার, খাদ্যের সৌন্দর্য বৃক্ষির জন্য রং প্রয়োগ ইত্যাদি একত্রে খাদ্যে ভেজাল বলে পরিচিত।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার তুলনায় তার যোগান অপ্রতুল। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন খাদ্যের দাম ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে খাদ্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পরিবহন ও সংরক্ষণজনিত সমস্যা। এ পরিস্থিতিতে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিক্রয় ও পরিবেশন একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে লাভ অনেক বেশি হওয়ায় ভেজাল খাদ্যের ব্যবসায় দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর ফলে জনস্বাস্থ্য আজ বিপন্ন ও জনজীবন হুমকির সম্মুখীন।

ভেজাল খাদ্য থেকে জনসাধারণ পেটের নানা রকম পীড়ায় ভুগছে। শরীর দুর্বল ও কৃশ হয়ে যাওয়া, শ্বরণশীল হ্রাস থাওয়া, শারীরিক ওজন অত্যধিক কমা বা বাড়া, চুল পড়া, মানসিক অবসাদ, অতিরিক্ত ক্লান্তি—এসবই ভেজাল খাদ্যের ফল বলা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে তাই ভেজাল খাদ্য এক মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এ সমস্যার দিকটি 'ক' দেশের বর্ণিত পরিস্থিতিতে লক্ষ করা যায়।

ঘ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেসরকারি সংস্থা ও জনগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
বেসরকারি সংস্থা: স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে দেশের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা ও খাদ্য নিরাপদকরণে ভূমিকা পালন করে আসছে। উন্নয়নে অংশীদার হিসেবে এনজিওর ভূমিকাও এ দেশে ব্যাপক। এ দেশের কিছু এনজিও সারাবিশ্বে রোল মডেল হিসেবে সকলতার সাথে কাজ করছে। তাই খাদ্য নিরাপদকরণেও তারা উন্নেখ্যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। এ দেশে খাদ্যে ভেজাল কেউ কেউ জেনে মেশায়, আবার অনেকে না জেনেও মেশায়। ভেজাল খাদ্যের উপাদানগুলো আমাদের শরীরে কী ক্ষতি করে তা সকলকে জানানোর ব্যবস্থা করতে পারে। আবার বিভিন্ন দিকনির্দেশনার মাধ্যমে জনগণকে ভেজালবিরোধী আন্দোলনে সংযুক্ত করা যায়। তারা সরকারকে ভেজালবিরোধী আইন তৈরিতে চাপ প্রয়োগ করতে পারে। জনগণের মাঝে ভেজাল নিরূপণকারী কিট সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারে। পচনশীল দ্রব্য সংরক্ষণে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবস্থা করতে পারে।

জনসাধারণ: সাধারণ জনগণ খাদ্যে ভেজাল মেশানো পছন্দ করে না। কিন্তু তাদের কাছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভেজাল নিরূপণকারী কিট না থাকায় খাদ্যে ভেজালের পরিমাণ জানতে পারছে না। সাধারণ জনগণ যদি এই ভেজালের বিরুদ্ধে বুঝে দাঢ়িয়ে তবে অবশ্যই দেশ থেকে ভেজালের সমস্যা দূর হবে। খাদ্যে ভেজাল মেশানো যে অনৈতিক এবং দণ্ডনীয় অপরাধ তা অনেকেই জানে না। তাদেরকে এ বিষয়গুলো সাধারণ জনগণ জানতে পারে, ভেজালবিরোধী আইন প্রয়োগে সরকারকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারে। ভেজালের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সকলকে উন্মুক্ত করতে পারে। কেউ খাদ্যে ভেজাল মেশালে তাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দিতে পারে। ভেজালযুক্ত খাদ্য ক্রয় থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মুরাদ সাহেব ঢাকার কাওরান বাজারে রাতে মাছ কিনতে যেয়ে দেখেন মাছগুলো সব তাজা ও সতেজ। তিনি মাছওয়ালাকে প্রশ্ন করলেন, মাছগুলো কবে ধরা হয়েছে? মাছওয়ালা উত্তর দিল গতকাল। তিনি ফল বাজারে গিয়ে দেখলেন, তাজা তাজা আম যেন এখন গাছ থেকে পাড়া। কিন্তু তিনি ভাবলেন, এখন তো আমের সময় না। তিনি কিছুক্ষণ দাঢ়িয়ে থেকে মাছ ও ফল না কিনে বাড়ি ফিরলেন। /চ. রো. ১৬। প্রশ্ন নং ৪/

ক. নিরাপদ খাদ্য কী?

১

খ. খাদ্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন?

২

গ. মুরাদ সাহেব কেন মাছ ও ফল না কিনে বাড়ি ফিরলেন?—ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. উদ্বিপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধান করার জন্য সরকার, ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের ভূমিকা কী হওয়া উচিত? মতামত দাও।

৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে শুরু করে ভোক্তা কাছে পৌছানো পর্যন্ত কোনোভাবেই দৃষ্টি হয় না এবং স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঢ়িয়ে না, তাকে নিরাপদ খাদ্য বলে।

খ খাদ্য যাতে পৈচে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

খাদ্য যেন পৈচে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করে খাদ্যের গুণগত মান অনুসারে খাদ্যকে বিভিন্নভাবে মজুত রাখা হলো খাদ্য সংরক্ষণ। খাদ্যদ্রব্যের পৃষ্ঠি উপাদানের গুণগত মান বজায় রাখা এবং খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও রূপ বহুদিনের জন্য অবিকৃত রাখাই খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। খাদ্যের অপচয় রোধ ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য খাদ্য সংরক্ষণ ও মজুত রাখা প্রয়োজন।

গ ফরমালিনযুক্ত মাছ ও আম তথ্য ভেজাল খাদ্য দেখে মুরাদ সাহেব মাছ ও আম না কিনে বাড়ি ফিরলেন। কারণ ভেজাল খাদ্য স্বাস্থ্য ও জীবনের জন্য হুমকিস্বৰূপ।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার তুলনায় তার যোগান অপ্রতুল। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন খাদ্যের দাম ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। সাম্প্রতিককালে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরান্ত্যে বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল মিশানো এবং মাছ, মাংস, ফলম

এক্ষেত্রে লাভ অনেক বেশি হওয়ায় ভেজাল খাদ্যের ব্যবসায় দিন দিন বেড়েই চলেছে। ভেজাল খাদ্য থেয়ে জনসাধারণ পেটের নানা রকম পীড়ায় ভুগছে। শরীর দুর্বল ও কৃশ হয়ে যাওয়া, স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়া, শারীরিক ওজন অত্যধিক কমা বা বাড়া, চুল পড়া, মানসিক অবসাদ, অতিরিক্ত ক্লান্তি— এসবই ভেজাল খাদ্যের ফল বলা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে তাই ভেজাল খাদ্য, এক মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। উল্লিখিত কথাগুলো চিন্তা করে মুরাদ সাহেব মাছ ও ফল না কিনে বাড়ি ফিরলেন।

৩ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধান করার জন্য সরকার, ব্যবসায়ী ও জনসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সরকার: একটি দেশের সরকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে দেশ থেকে দ্রুত খাদ্যে ভেজাল দূর করা সম্ভব। সরকার ভেজালবিরোধী আইনের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ও বিক্রির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে আইনের আওতায় আনতে পারে। সংসদে ভেজালবিরোধী যুগোপযোগী আইন পাসের মাধ্যমে ভেজাল খাদ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে কঠোর শাস্তির বিধান করতে পারে। আবার তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ভেজাল প্রদানকারী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে পারে। খাদ্যে ভেজালের উদ্দেশ্যে যে সকল উপাদান যেমন- ফরমালিন, কার্বাইড, ইথানল ইত্যাদি আমদানি করা হয়, তা আইনের মাধ্যমে বাতিল অথবা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে পারে। এভাবে নানা কর্মকাণ্ডের দ্বারা সরকার খাদ্য নিরাপদকরণে ভূমিকা রাখতে পারে।

ব্যবসায়ী: ব্যবসায়ীরা খাদ্য নিরাপদকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাচ্ছে। এ দেশে খাদ্যে ভেজাল কেউ কেউ জেনে মেশায়, আবার অনেকে না জেনেও মেশায়। এ অবস্থায় দেশের সৎ ও ভালো ব্যবসায়ীরা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন।

জনসাধারণ: খাদ্যে ভেজাল মেশানো যে অনৈতিক এবং দণ্ডনীয় অপরাধ তা অনেকেই জানে না। অসাধু ব্যবসায়ীদেকে এ বিষয়গুলো সাধারণ জনগণ জানাতে পারে, ভেজালবিরোধী আইন প্রয়োগে সরকারকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারে। ভেজালের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সকলকে উদ্ব�ৃদ্ধি করতে পারে। কেউ খাদ্যে ভেজাল মেশালে তাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দিতে পারে। ভেজালযুক্ত খাদ্য ক্রয় থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে।

প্রশ্ন **১৬** ইমরান সাহেবের অফিস শেষে বাসায় ফেরার পথে রাস্তার পাশে ফলমূল, মাছ এবং সবজির বিশাল মজুত দেখে খুশি হন। কিন্তু কেনার সাহস পান না। কারণ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছেন ফলমূল, মাছ এবং সবজি দীর্ঘসময় ধরে সতেজ এবং পচনরোধে ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করেন, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বৃপ্ত। জনমনে আতঙ্ক দূর করার জন্য সরকার 'Consumer Protection Act' এবং 'Food Act' সহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগ করে। জনসচেতনতা সৃষ্টি, ভেজাল খাদ্য বর্জন, আইন প্রয়োগ ও প্রয়োগে বাধ্য করার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ এর সাথে সম্পৃক্ত হয়।

/সি. বো. ১৬/ গুপ্ত নং ৫/

ক. খাদ্যের উপযোগিতা কী?

খ. মোট দেশজ উৎপাদন অধিক হওয়া খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে কি? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইমরান সাহেবের আতঙ্কের বিষয়টি কোন ধারণার সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জনমনের আতঙ্ক কমানোর জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট কি না মতামত দাও।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ইমরান সাহেবের আতঙ্কের বিষয়টি ভেজাল খাদ্যের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত।

ফরমালিনযুক্ত মাছ ও আম তথ্য ভেজাল খাদ্য দেখে ইমরান সাহেব মাছ ও আম না কিনে বাড়ি ফিরলেন। কারণ ভেজাল খাদ্য স্বাস্থ্য ও জীবনের জন্য হুমকিস্বৃপ্ত।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার তুলনায় তার যোগান অপ্রতুল। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন খাদ্যের দাম ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। সাম্প্রতিককালে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরান্যে বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল মিশানো এবং মাছ, মাংস, ফলমূল প্রভৃতি দ্রব্যে ফরমালিনসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহারের ফলে খাদ্যদ্রব্য অনিরাপদ হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিক্রয় ও পরিবেশন একটি ল্যাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে লাভ অনেক বেশি হওয়ায় ভেজাল খাদ্যের ব্যবসায় দিন দিন বেড়েই চলেছে। ভেজাল খাদ্য থেয়ে জনসাধারণ পেটের নানা রকম পীড়ায় ভুগছে। শরীর দুর্বল ও কৃশ হয়ে যাওয়া, স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়া, শারীরিক ওজন অত্যধিক কমা বা বাড়া, চুল পড়া, মানসিক অবসাদ, অতিরিক্ত ক্লান্তি— এসবই ভেজাল খাদ্যের ফল বলা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে তাই ভেজাল খাদ্য এক মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।

৪ সুন্দর, সুস্থ জাতি গঠনের জন্য নিরাপদ খাদ্য আবশ্যিক। জনগণের আতঙ্ক কমানোর জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো যথেষ্ট বলে আমি মনে করি।

নিরাপদ খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণে সরকারের ভূমিকা অগ্রগণ্য। ঐ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার 'Consumer Protection Act' & 'Food Act' সহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগনের কাজ বাস্তবায়ন করেছে।

খাদ্যের ভেজাল রেখে সরকার নিরাপদ আইন ২০১৩ পাস করছে সরকার। এ আইনে খাদ্যে ভেজালের জন্য ৫ বছরের কারাদণ্ড ও ২০ লক্ষ টাকার জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। এ আইন ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে কার্যকর করা হয়েছে। ফলে কিছুটা খাদ্য নিরাপদ রাখার ফেরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভয় তৈরি হতে পারে।

জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য সরকার টেলিভিশন, পত্রিকা এবং পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব বর্ণন্য করতে পারে। যার ফলে অসাধু ব্যবসায়ীরা এই ধরনের ভেজাল খাদ্য তৈরি ও বিপণন হতে সতর্ক হয়ে উঠেছেন। মাঠপর্যায়ে প্রতিটি স্তরে মান যাচাইয়ের জন্য মাঠকর্মী নিয়োগ, তথ্যকেন্দ্র স্থাপন, খাদ্যের নিরাপত্তা ও গুণগত মান বাস্তাইকরণের জন্য সরকার নানামূল্যী কর্মসূচি গ্রহণ করে।

ফলে বলা যায়, জনগণের আতঙ্ক দূর করার জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন **১৭** গ্রামে বসবাসকারী রহিম মিয়া একজন গরিব কৃষক। অন্যের জমি চাব করে কোনোভাবে তিনি পরিবারের উপরগোপন করেন। এ বছর বন্যার পানিতে তার জমির ফসল ডুবে যায়। বন্যার ফলে খাদ্যশস্যের দামও বৃদ্ধি পায়। ফলে রহিম মিয়ার পরিবারের সদস্যদের প্রায় দিনই না থেয়ে কাটাতে হয়। অন্যদিকে, শহরে বসবাসকারী আফজাল হোসেন অসাধু মৌসুমি ফল বিক্রেতা। অতিরিক্ত মুনাফার লোডে সে মৌসুমি ফলে বিভিন্ন ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদি মেশায়, যা মানুষের নানারকম রোগব্যাধি হওয়ার ঝুঁকি বাঢ়াচ্ছে।

/সি. বো. ১৬/ গুপ্ত নং ৫/

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কী?

খ. খাদ্যের প্রাপ্যতা কীভাবে মজুত হ্রাস প্রভাবিত হয়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের আলোকে রহিম মিয়ার খাদ্য নিরাপত্তার কোন কোন দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে?

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে বলে তুমি মনে করো?

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের সন্তোষজনক ও টেকসই যোগান, যা গ্রহণে সকল মানুষের সক্ষমতা রয়েছে, তাই খাদ্যের উপযোগিতা।

খ মোট দেশজ উৎপাদন অধিক হওয়া খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব। কোনো দেশের মোট দেশজ উৎপাদন অধিক হলে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক হয়। এক্ষেত্রে দেশজ উৎপাদন দেশের জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, ভর্তুকি প্রদান, খাদ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে সরকারের অংশগ্রহণ, সংরক্ষণ ও গুদামজাত ব্যবস্থা প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে। ফলে অধিক উৎপাদন খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে।

ক যখন সমাজের সকল লোক শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার ক্রয়যোগ্যতার মধ্যে পেয়ে থাকে, তখন তাকে খাদ্য নিরাপত্তা বলা হয়।

ব একটি দেশের সার্বিক প্রাপ্যতা তথা খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে খাদ্য মজুদের ভূমিকা অপরিসীম।

খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম অত্যাবশ্যক দিক হলো খাদ্যের প্রাপ্যতা। আর এই প্রাপ্যতাকে পর্যাপ্ত রাখার জন্য প্রয়োজন খাদ্য মজুদ রাখা। এর ফলে আপনাকালীন খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করা যায়। মূলত সরকারের অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ আমদানি এবং খাদ্য সাহায্যকে অবস্থন করে খাদ্যের মজুদ গড়ে ওঠে। যেমন— বাংলাদেশে সরকার প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য মজুদ রাখে। যা দেশের খাদ্যের প্রাপ্যতা তথা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

গ উদ্দীপকের আলোকে রহিম মিয়ার খাদ্য নিরাপত্তার খাদ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা ও ভোগ এ বিষয়গুলো উপেক্ষিত হয়েছে।

রহিম মিয়া একজন গরিব কৃষক। অন্যের জমি চাষ করে পরিবারের ভরণপোষণ করে। কিন্তু বন্যায় তার চাষকৃত জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তার পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যাহত হয়েছে। বন্যায় ফসল নষ্ট হওয়ায় রহিম মিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মজুত গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে খাদ্য নিরাপত্তার খাদ্যের প্রাপ্যতা দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে।

আবার, বন্যার ফলে খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি পায়। রহিম মিয়া গরিব হওয়ায় তার পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্য উচ্চমূল্যে ক্রয় করতে পারেন না। অর্থাৎ তার প্রয়োজনীয় খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা নেই। ফলে তার পরিবারের সদস্যদের প্রায় দিনই না খেয়ে কাটাতে হয়। এভাবে খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতার অভাবে রহিম মিয়া ও তার পরিবারের সদস্যদের খাদ্যের ভোগ বা ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং, উদ্দীপকের আলোকে রহিম মিয়ার খাদ্য নিরাপত্তার খাদ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয়যোগ্যতা এবং ভোগ —এই তিনটি দিক উপেক্ষিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নিতে পারে—

১. খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করে সরকার উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, জ্বালানি ও বিদ্যুতের ওপর ভর্তুক ও বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারে।

২. খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকার বন্ধুসূজিভ দেশগুলোর সাথে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে। খাদ্য মজুত বৃদ্ধি, গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি এবং খাদ্য মজুত সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে সরকার।

৩. সরকার খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে কঠোর হতে পারে। উদ্দীপকে উল্লিখিত আফজাল হোসেনের মতো অসাধু ব্যবসায়ীদেরকে সরকার আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তির বিধান করতে পারে। সরকার বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন— টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র ইত্যাদিকে খাদ্য ভেজালবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে।

সরকার কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় দেশটির সামগ্রিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে পারে। খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রির মাধ্যমে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

এছাড়া সরকার নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের বিনিয়োগ গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো ও প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন, টিআর (টেস্ট রিলিফ), কাবিখা (কাজের বিনিয়োগ খাদ্য) এবং VGD & VGF ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে।

অতএব নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে সরকারের ভূমিকা প্রধান।

প্রশ্ন ১৮ শফিকুল মিয়া একজন মাছ ব্যবসায়ী। মাছকে দীর্ঘদিন ভালো রাখতে এবং পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি এক ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করেন। তার এ মাছ না বুঝেই জনসাধারণ ক্রয় করে। এতে শফিকুল মিয়ার প্রচুর লাভ হয়।

১/১ বোঝে ৩৬। প্রশ্ন নং ৮।

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কী?

১

খ. নিরাপদ খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?

২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শফিকুল মিয়ার কার্যক্রম নিরাপদ খাদ্যের কার্যক্রমকে কীভাবে ধ্বংস করছে?

৩

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যার আলোকে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে

সরকারের কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে তুমি মনে করো? ৪

ক. খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বোঝায় যেখানে দেশের সব মানুষ সবসময় বাহ্যিক ও অখণ্ডিতিক দিক থেকে তাদের প্রয়োজনমাফিক খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে।

ব খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খাদ্যের প্রাপ্যতা ও ক্রয়যোগ্যতা নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে তা নিরাপদ করাও প্রয়োজন।

নিরাপদ খাদ্য মানুষকে সুস্থ সবল রাখে; ফলে সে জীবনের বেশির ভাগ সময় কর্মক্ষম থাকে। খাদ্য নিরাপদ হলে রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং কর্মক্ষম থাকা সম্ভব হয়। নিরাপদ খাদ্য পুষ্টিসমূহ হয় বলে তা থেকে পুষ্টি আহরণ সম্ভব হয় যা দেহ ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটায়। তাই খাদ্য নিরাপদ হওয়া প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শফিকুল মিয়ার কার্যক্রম নিরাপদ খাদ্যের কার্যক্রমকে বিভিন্নভাবে ধ্বংস করছে। শুধু শফিকুল নয় তার মতো অনেক অসাধু ব্যবসায়ী এ ধরনের অনৈতিক কাজ করছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ভেজাল খাদ্য এক মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। খাদ্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ফরমালিন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথোফেন, কাপড়ের রং, কীটনাশক যেমন- এক্স্ট্রিন, ডিভিটি, হেণ্টাক্লোর ইত্যাদি। ফল কৃতিম উপায়ে পাকাতে ব্যাপকভাবে ক্যালসিয়াম কার্বাইড, কপার সালফেট, কার্বনের ধোয়া, পটাশের লিকুইড সলিউশন এবং তাজা ও সতেজ রাখতে ফরমালিন ব্যবহার করা হচ্ছে। আম, কলা, খেজুর, পেপে, আনারস, মাল্টা, আপেল, আজগুর এবং অন্যান্য ফলে ব্যবহৃত হচ্ছে- ফরমালিন, কার্বাইড, কীটনাশক ইত্যাদি। মাছে ফরমালিন, শাকসবজিতে কীটনাশক ও ফরমালিন, শুটকিতে ডিভিটি ব্যবহার করা হচ্ছে। টমেটোতে ব্যবহৃত হচ্ছে ফরমালিন। মিষ্টিতে কাপড়ের রং, এবং কৃতিম মিষ্টিদায়ক প্রয়োগ করা হচ্ছে। এমনকি মুড়ি ও চিড়াতেও হাইডোজ, ইউরিয়া ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানির উৎপাদিত প্যাকেটেজাত খাদ্য যেমন— ফলের রস, ম্যাকসফুড, জ্যাম, জেলি, আচার, চাটনিতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রং ব্যবহার করা হয় এবং সেমাই ও নুডলসে ফরমালিন ব্যবহার করা হয়।

এক কথায় শিশু খাদ্য থেকে শুরু করে মাছ-মাংস, ফলমূল, শাকসবজি, দুধ, মিষ্টি, প্যাকেটেজাত খাদ্যসহ প্রায় সব ধরনের খাবারে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে ভ্রাম্যাম্ব আদালতের অভিযানে, গণমাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন সংবাদ ও প্রতিবেদনে ঢাকার বাজারে মৌসুমি ফলে ফরমালিন পরীক্ষার ফলাফল ও বিষাক্ত খাদ্যের ব্যাপকভাবে যে চিত্ ফুটে ওঠে, তা বীতিমতো আতঙ্কজনক। ফলে জনস্বাস্থ্য আজ বিপন্ন ও জনজীবন ধ্বংসের সমূহীন।

ঘ উদ্দীপকের সমস্যার আলোকে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সরকার নানামূর্খী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে বলে আমি মনে করি।

প্রথমত, একটি দেশের সরকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে দেশ থেকে দুত খাদ্যে ভেজাল দূর করা সম্ভব। সরকার ভেজালবিরোধী আইনের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ও বিক্রির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে আইনের আওতায় আনতে পারে।

দ্বিতীয়ত, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশন (টিসিবি) কে শক্তিশালী করতে পারে। এর মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য তথা ভেজালমুক্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হবে।

তৃতীয়ত, খাদ্যে ভেজাল বা ভেজাল খাদ্য বিভিন্নভাবে দেশে উৎপাদন হয়। এসব উৎপাদন সরকার চাইলেই বন্ধ করে দিতে পারে। আবার বিদেশ থেকে কোনো ভেজাল খাদ্য আমদানি করা হলে সরকার তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে।

চতুর্থত, খাদ্যে ভেজাল সংক্রান্ত বর্তমান যেসব আইন রয়েছে তার দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করতে হবে এবং কঠোর নতুন আইন তৈরি করতে হবে। সরকার সংসদে ভেজালবিরোধী যুগোপযোগী আইন পাসের মাধ্যমে ভেজাল খাদ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কঠোর শাস্তির বিধান করতে পারে। আবার তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালন